দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..20 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৪...

সাদাসিধে কথা ■ মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বিশ্ববিদ্যালয়

বছরের এই সময়টা মনে হয় দীর্ঘশ্বাসের সময়, এই সময়টিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো হয়। খুব সহজেই সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটা ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারতো কিন্তু তারপরও শুধু কিছু বাড়তি টাকা উপার্জন করার জন্য প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা আলাদা ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। বছরের এই সময়টাতে দেশের ছেলে-মেয়েরা একেবারে দিশেহারা হয়ে দেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়। পরীক্ষার সময় কিছু জাল-পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে, কিছু হাই-টেক নকলবাজ ধরা পড়ে। যে কয়জন ধরা পড়ে তার তুলনায় নিশ্চিত ভাবেই অনেকে ধরা পড়ে না। সেটি নিয়ে খুব ব্যস্ত হওয়ারও কিছু নেই। মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হবার পরও সরকার বা কর্মকর্তারা চোখ বুজে থেকেছেন। বড় অন্যায় দেখেও যদি চোখ বুজে থাকি তাহলে কিছু "সৃজনশীল" নকলবাজ যদি পুরো ভর্তি প্রক্রিয়াকে কাঁচকলা দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায় তাহলে সেটা নিয়ে হই-চই করার কী আছে? আমরা তো রাষ্ট্রীয় ভাবেই ঠিক করে নিয়েছি লেখাপড়া একটা গুরুত্বহীন বিষয়।

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল দেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শুরু হয়। সেটি আমার জন্যে সব সময়েই একটা মন খারাপ করা বিষয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই দুই-একটি বিষয় হচ্ছে "কাঙ্ক্ষিত" বিষয়, সবাই এই বিষয়গুলো পড়তে চায়। যারা সেই বিষয়গুলো পড়তে পারে না তাদের দেখে মনে হয় তাদের জীবন বুঝি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল! কাজেই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবার পর অল্প কিছু ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্য সবাই আবিষ্কার করে তারা যে বিষয় পড়ার স্বপ্ন দেখেছিল সেই বিষয়টি পায় নি. ফলাফলের ক্রমানুসারে তার হাতে কোনো একটি বিষয় ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই বিষয়টি পড়ায় তাদের আগ্রহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া হওয়া উচিত আনন্দ এবং উৎসাহময়, এখানে জ্ঞানের চর্চা হবে এবং জ্ঞানের সৃষ্টি হবে; কিন্তু আমরা দেখি বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী নিরানন্দ একটা পরিবেশে কোনো ভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে! যে ছেলে-মেয়েগুলো এই পরিবেশে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে এবং একটা ডিগ্রি নিয়ে বের হতে পারে আমি সবসময় তাদের সেল্যুট জানাই। আমি আজকাল সবসময় জোর গলায় সবাইকে বলি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসরুমের ভেতরে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যেটুকু শিখে তার চাইতে অনেক বেশি শিখে ক্লাসরুমের বাইরে। এই দেশে আমি প্রায় বিশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার সাথে যুক্ত আছি, আমার অভিজ্ঞতা খুব কম হয়নি। আমি মোটামুটি ভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে বলতে পারি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আমরা এখনো ঠিক করে মূল্যায়ন করতে পারি না! একজন ছেলে বা মেয়ের অনেক ধরনের বুদ্ধিমত্তা থাকে, আমরা তার মাঝে শুধু কাগজে-কলমে লেখাপড়ার বুদ্ধিমত্তাটা যাচাই করি, তাঁর যে আরও নানারকম বুদ্ধিমত্তা আছে সেগুলোর খোঁজ নিই না। আমি মোটামুটি অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি যে আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর ভেতর যারা পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল করেছে সত্যিকারের জীবনে তারাই আবার সত্যিকারের সাফল্য দেখিয়েছে সেটি পুরোপুরি সত্যি নয়। ক্লাসরুমে একেবারে গুরুত্বহীন ছাত্রটি, যাকে কখনো ভালো করে লক্ষ করিনি, সে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা দলের নেতৃত্ব দিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে দিচ্ছে-এই ঘটনাটি এতোবার ঘটেছে যে আমি পরীক্ষার ফলাফল বিষয়টিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি। আমি নিজের অজান্তেই এখন আমার ছাত্রছাত্রীদের ভেতর লেখাপড়ার বুদ্ধিমত্তার বাইরে অন্য বুদ্ধিমত্তাগুলো খুঁজে বেড়াই।

২.

আমাদের দেশের সবচেয়ে উৎসাহী এবং আগ্রহী ছেলেমেয়েগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয়। দেশে এখন একশ থেকে বেশি পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দুটোরই পড়াশোনার পদ্ধতি মোটামুটি একরকম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন তিন বছর পর একটা ফাইনাল পরীক্ষা হতো বিষয়টি চিন্তা করেই এখন আতংকে আমার গায়ের লোম দাঁড়া হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার তিন বছর পর যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে প্রথম দুই বছর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে কারো কিছু বলার থাকে না। তৃতীয় বছরে এসে প্রথমবার কী কী বিষয়ে লেখাপড়া হয় সেগুলো একটু খোঁজখবর নিতে শুরু করেছি এবং পরীক্ষার ঠিক তিন মাস আগে ঘরের দরজা- জানালা বন্ধ করে পড়ালেখা শুরু করেছি। সেই পড়ালেখা ছিল এক ধরনের ভয়ংকর অমানবিক লেখাপড়া—খাওয়া ঘুম এবং প্রাকৃতিক কাজ ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যে পড়ার টেবিল থেকে না উঠে যে টানা পড়াশোনা করা সম্ভব সেটি এখন আমার নিজেরও বিশ্বাস হয় না। আমার মনে আছে সময়মতো খাওয়া এবং ঘুম হবার কারণে অনার্স পরীক্ষার্থী আমাদের সবার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গিয়েছিল এবং দরজা-জানালা বন্ধ করে চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার ঘরে বসে থাকার কারণে ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মত আমাদের গায়ের রং ফর্সা হয়ে গিয়েছিল!

আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন স্নাতক ডিগ্রি দেয়া হতো তিন বছর পর সেটাকে বলা হতো অনার্স ডিগ্রি। তারপর এক বছর লেখাপড়া করে একজন মাস্টার্স ডিগ্রি পেয়ে যেতো। মোটামুটি চার বছরেই লেখাপড়া শেষ—সেশন জ্যামের কারণে সেটা হয়তো মাঝে মাঝে আরো বেড়ে যেতো। মিলিটারি শাসনের সময় মনে হয় লেখাপড়ার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে কম তাই সেশন জ্যাম ছিল সবচেয়ে বেশি। তিন-চার বছরের লেখাপড়া করতে সাত-আট বছর লেগে যেতো।

আমি দেশে আসার পর তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রিটা পাল্টে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি করে ফেলার পরিবর্তনটুকু নিজের চোখে দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কী আমি দায়িত্ব নেবার পর প্রথম ব্যাচটি তিন বছরে তাদের স্নাতক ডিগ্রি শেষ করেছিল। এর পরের বছর থেকে সবাই চার বছরে তাদের স্নাতক ডিগ্রি নিতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের সঙ্গে মিল রেখে এই পরিবর্তনটুকু করা হয়েছিল এবং আমি নিশ্চিত ভাবে জানি তখন আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম এই চার বছরের স্নাতক বা ব্যাচেলর ডিগ্রি হবে চূড়ান্ত বা টার্মিনাল ডিগ্রি। অর্থাৎ চার বছর পড়াশোনা করে ডিগ্রি নিয়ে সবাই কাজকর্মে ঢুকে যাবে। আগেও চার বছর লেখাপড়া করে কর্মজীবন শুরু করে দিতো। নূতন নিয়মেও সবাই চার বছর লেখাপড়া করে কর্মজীবনে ঢুকে যাবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্স করার কোনো প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর অন্য সব দেশের সঙ্গে মিল রেখে মাস্টার্স করবে শুধু যারা শিক্ষকতা করবে বা গবেষণা করবে সেই ধরনের ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম কেমন করে জানি চার বছরের স্নাতক বা ব্যাচেলরস ডিগ্রিটাকে চূড়ান্ত (টার্মিনাল) ডিগ্রি হিসেবে বিবেচনা না করে মাস্টার্স ডিগ্রিকেই টার্মিনাল ডিগ্রি হিসেবে ধরে নেয়া হল। চাকরি-বাকরির বিজ্ঞাপনে আবার সবাই মাস্টার্স ডিগ্রি চাইতে শুরু করল এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের ব্যাচেলরস ডিগ্রির পর আবার এক বছর, দেড় বছর কিংবা দুই বছরের একটা মাস্টার্স ডিগ্রির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়ে যেতে বাধ্য হল। একজন মানুষের জন্যে এক বছর দুই বছর অনেক দীর্ঘ সময়, আমরা অনেক ছাত্রছাত্রীর জীবন থেকে অবিবেচকের মতো এই সময়টুকু কেড়ে নিতে শুরু করলাম। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ছেলে-মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে ঢুকে যাবে তাদের জন্যে সেটা ততই মঙ্গল কিন্তু আমরা অবিবেচকের মতো সেটা হতে দিচ্ছি না। পাশ্চাত্যের অনেক দেশের অনুকরণ করে আমরা তিন বছরের স্নাতক ডিগ্রিকে চার বছরের স্নাতক করেছি। এর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব দেশের মতো চার বছরের ডিগ্রিটাকেও চূড়ান্ত ডিগ্রি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। আমরা সেটা করিনি। সে কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপরেও অনেক বাড়তি চাপ পড়েছে যেটা আমরা প্রতি মুহূর্তে টের পাই।

৩.

ঠিক কী কারণ জানা নেই আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম তখন পাস করে চাকরি পাব কী না সেই বিষয়টা নিয়ে একেবারেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমাদের যার যে বিষয় পড়ার শখ সেই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি। দেশ তখন মাত্র স্বাধীন হয়েছে অর্থনীতি বলে কিছু নেই। সেই সময়ে চাকরি-বাকরি নিয়ে আমাদের অনেক ব্যস্ত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা মোটেও ব্যস্ত হইনি। মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার আগে আমাদের স্যারেরা খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন, "দেখো বাবারা এই সাবজেক্টে পড়ে কিন্তু তোমরা কোনো চাকরি-বাকরি পাবে না"—সেটা শুনেও আমাদের উৎসাহে কোনো ভাটা পড়েনি, কারণটা কী এখনও আমি বুঝতে পারি না।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় একজন ছাত্রছাত্রী সে কোন্ বিষয়ে পড়ছে সেটা নিয়ে যত উদ্বিগ্ন থাকে তার চাইতে শতগুণ বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের অভিভাবকেরা। আমি অনেকবার দেখেছি ছেলে-মেয়েরা তাদের পছন্দের বিষয় না পড়ে অনেক সময়েই বাবা-মায়ের চাপে পড়ে অন্য বিষয়ে ভর্তি হয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো সময়টুকু লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাটিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাটানোর কথা নয়—আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে সময় কাটানোর কথা।

এক সময় এই দেশের অল্প কিছু মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও ছিল একেবারে হাতেগোনা—এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেরকম বেড়েছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। আমি যতদূর জানি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা থেকে বেশি। এই বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ঠিক করে লেখাপড়া করানো এখন খুবই জরুরি।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং তাদের অনেকগুলোই খুবই চমৎকার ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের নানা ধরনের পদ্ধতি চেষ্টা করে একটা সফল পদ্ধতি বের করার প্রয়োজন নেই, যে পদ্ধতিগুলো ইতোমধ্যে ভালোভাবে কাজ করেছে সেগুলোই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করে দেয়া যায়। আমি এরকম দুটো বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমটি হচ্ছে দুটি ভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি নেয়া। আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে কোনো কোনো বিষয়ের ডিগ্রি থাকলে চাকরি-বাকরি পাওয়া সহজ হয়। ছাত্রছাত্রীদের সেই বিষয়ে পড়ার অনেক আগ্রহ থাকে—যারা এই বিভাগে ভর্তি হতে পারেনি তাদেরকেও এই বিষয়ে ডিগ্রি নেয়ার সুযোগ করে দেয়া যায়। কাছাকাছি দুটি বিষয়ের জন্যে বিষয়টি খুবই সহজ—তার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের শুধু বাড়তি কিছু কোর্স নিতে হয়। নিজেদের ওপর বাড়তি চাপ না দিয়েই ছেলে-মেয়েদের পক্ষে দ্বিতীয় একটি বিভাগে ডিগ্রি নেয়া সম্ভব। আমি যতদূর জানি আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্ততপক্ষে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিটি চালু আছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটু নতুন হলেও আমার ধারণা এটি খুবই প্রয়োজন। একজন ছাত্র কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করবে সেই সিদ্ধান্তটি ভর্তির সময়ে না নিয়ে এক কিংবা দুই বছর পরে নেয়া। সব ছাত্রছাত্রীকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কিছু বিষয়ে কোর্স নিতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা যদি প্রথম এক বা দুই বছর সেই কোর্সগুলো নিতে থাকে তাহলে সে বুঝতে পারে কোন্ বিষয়টাতে লেখাপড়া করা তার জন্যে বাস্তবসম্মত। ভর্তি পরীক্ষায় আমরা আসলে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি না। এক বা দুই বছর সে যদি অনেকগুলো মৌলিক কোর্স নিয়ে নেয় তখন তার ফলাফল থেকে সেই ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত সামর্থ্য কিংবা দুর্বলতাগুলো ধরে ফেলা যায়। তখন ছাত্র বা ছাত্রীটিকে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করার সুযোগ করে দিলে সেটি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ভালো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেও ভালো।

আমি যে দুটি বিষয়ের কথা বলেছি এর দুটিই কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই চালু আছে এবং ছেলে-মেয়েরা এই পদ্ধতিতে বেশ ভালো ভাবেই পড়াশোনা করে আসছে। যেহেতু আমাদের লেখাপড়ার পদ্ধতি মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করতে হয় তাই এ ধরনের বড় একটা পরিবর্তন করার সাহস করা খুব কি কঠিন?

৪.

পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মাঝে মাঝে র‍্যাংকিং করা হয়, অর্থাৎ কোনটা সবচেয়ে ভালো বা এক নম্বর, কোনটা দুই নম্বর এভাবে তালিকা করা হয়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনো সেই তালিকায় আসে না—কিংবা এলেও সেটা এতো নিচে থাকে যে আমরা সেটা দেখে না দেখার ভান করি! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেকগুলোই তালিকার একেবারে উপরের দিকে আছে এবং আমরা ধরেই নিতে পারি যে তাদের লেখাপড়ার পদ্ধতি নিশ্চয়ই অসাধারণ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যুক্তরাষ্ট্রের খুব বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ একজন ইঞ্জিনিয়ারের একটা লেখা পড়ে খুবই অবাক হয়েছিলাম। তিনি লিখেছেন যে, "আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পদ্ধতি হচ্ছে জঘন্য এবং কুৎসিত! ছেলেমেয়েরা কিছুই শিখে না এবং জানে না। তারপরও আমরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া ছেলে-মেয়েদের খুব আগ্রহ নিয়ে চাকরি দেই একটি মাত্র কারণে। সেটি হচ্ছে এরকম জঘন্য এবং কুৎসিত একটা পদ্ধতিতে তারা টিকে গেছে এবং বের হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা অসাধারণ তা না হলে তারা কেমন করে এই কুৎসিত পদ্ধতি থেকে বের হতে পারল? যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা কিছুই শিখে আসে না তাই চাকরি দেবার পর আমরা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় শেখাই এবং তারা তখন সত্যিকারের কাজের মানুষ হয়।"

সেই বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের কথা পড়ে আমি হাসি চেপে রাখতে পারিনি। আবার একই সঙ্গে এক ধরনের সান্ত্বনা পেয়েছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যেও আমরা নিশ্চয়ই একই কথা বলতে পারব! আমাদের ছেলে-মেয়েদের বেলায় আমরা আরো নতুন কথা যোগ করতে পারব—তাদেরকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া শিক্ষকদের কাছে পড়তে হয়, ছাত্র রাজনীতির ধাক্কা সামলাতে হয়, অনেককে প্রাইভেট টিউশনি করে খরচ চালাতে হয়। কাজেই সেশন জ্যামের পীড়ন সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা যখন বের হয় তখন তারা সবাই নিশ্চয়ই এক ধরনের অসাধারণ ছেলে-মেয়ে!

তাই আমি আমার সব ছাত্রছাত্রীকে মনে করিয়ে দেই ক্লাসরুমের ভেতরে তারা যেটুকু শিখবে তার থেকে অনেক বেশি শিখবে ক্লাসরুমের বাইরে! ম্যাক্সিম গোর্কির একটি বইয়ের নাম "আমার বিশ্ববিদ্যালয়" (My Universities) এটি একটি অসাধারণ বই যেখানে তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কি কিন্তু কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেননি—এই পৃথিবীটাই ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয়।

● লেখক : কথাসাহিত্যিক, শিক্ষক,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া হওয়া উচিত আনন্দ এবং উৎসাহময়, এখানে জ্ঞানের চর্চা হবে এবং জ্ঞানের সৃষ্টি হবে; কিন্তু আমরা দেখি বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী নিরানন্দ একটা পরিবেশে কোনো ভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করছে! যে ছেলে-মেয়েগুলো এই পরিবেশে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে এবং একটা ডিগ্রি নিয়ে বের হতে পারে আমি সবসময় তাদের সেল্যুট জানাই। আমি আজকাল সবসময় জোর গলায় সবাইকে বলি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসরুমের ভেতরে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যেটুকু শিখে তার চাইতে অনেক বেশি শিখে ক্লাসরুমের বাইরে।